Rajshahi University journal of arts & law Vol. 52 (2024) pp. 91-102
ISSN 2309-0898 (Print), 2408-8773 (Online)
https://doi.org/10.64102/rujal.0707

গণনায়ক: নৈরাশ্যের বিপরীতে আশার আলোকবর্তিকা

[*Gananayaka* : A Beacon of Hope against Despair]

ফাহমিদা সুলতানা তানজী*

Abstract

In order to keep the ethical ideals of the Bengali nation moving against the brutality of the 1975s, the textual essay *Gananayaka* (1976) by Sabyasachi playwright Syed Shamsul Haque (December 27, 1935-September 27, 2016) is a proof of hope against despair. *Gananayaka* is the central character of the play Osman, who is addressed as *Gananayaka* in the play. After the independence of the country in 1971, *Gananayaka*, discussed in the play, took over the power of independent Bengal. However, his state power was short-lived. History of Bengal has witnessed that he faced tough conspiracies and he was able to overcome the negative forces to counter those conspiracies. Playwright Syed Haque has been able to create metaphors very well with the story of the assassination of Kananayak and the picture of the overall situation in Bangladesh. The father of the nation, which in the eyes of the common man was only lost by murder, languishing in the stagnation of the unclaimed, was able to carry the seeds of his dream later with great prudence. There has been a lot of research on this great man of history, but very little research work has been done on Syed Haque's *Gananayaka* texts. In the socio-economic and political life of the Bengali nation, the group of assassins tried to spread doubts and confusion in the dark night of 75, collecting the seeds of research from there, the budding researcher will be active in carrying out the work. It should be noted that drama is created in a mixed way of imagination and reality. Although it does not directly apply reality, there is no room to express doubt about the artistic quality, but the reader does not have to suffer from any historical confusion with the *Gananayaka* play. Why the assassins were forced to go into hiding after the assassination of Gananayaka, is a very significant subject in the essay. In analyzing the political situation of the time, the contemporary researcher will be primarily concerned with the inquiry, in what way a leader becomes a republican. The essayist will conduct a research process based on a mixed method analysis of information and data subject to third party positions in a very conscious manner. The result will attempt to prove that Syed Haque's *Gananayaka* (1976) is clearly capable of instilling hope as opposed to despair.

Keywords: *Mujib, Gananayaka, History, Motherland, War, Killers, Bangali, Patriotism.*

১.১ ভূমিকা

বর্তমান যুগ ক্রমবর্ধমান আত্মসচেতনতার যুগ। এ যুগে মানুষ যতই বিচ্ছিন্ন থাকুক না কেন, সে তার চারপাশে অস্তিত্বশীল সত্তা সম্পর্কে স্বীয় আত্মাকে প্রশ্ন করে তার পরিচয় সম্পর্কে। আজও আত্মসচেতন মানুষ সমাজে যূথবদ্ধরূপে বসবাস করে ও তাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন একজন নেতার, কিংবা একজন নায়কের। বাঙালি এমনি এক ভাগ্যবান জাতি যারা একজন নেতার ভাবাদর্শের

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ৪৩৩১, বাংলাদেশ;
ই-মেইল: fahmida.tanjee@gmail.com

ভাণ্ডারে আবিষ্কার করেছিল এমন একজন নায়কের, যিনি জাতিতে বাঙালি হয়েও সমগ্র বিশ্বে রেখে গিয়েছেন তাঁর বিজ্ঞতার ছাপ। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, বাঙালি জাতির প্রতিষ্ঠার পেছনে কৃর্তিময় এই ব্যক্তিত্বের অবদান ছিল অতুলনীয়। প্রবন্ধের গন্তব্য সৈয়দ শামসুল হকের (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫- ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬) *গণনায়ক* (১৯৭৬) শীর্ষক কাব্যনাটককে কেন্দ্র করে। উল্লেখ্য যে, কাব্যনাটকটিতে প্লটকে গতিশীল রাখতে কিছু চরিত্রের অবতারণা করেছেন নাট্যকার। বর্তমানে সাহিত্যে ইতিহাসকে মোকাবিলা করার ভাষা অত্যন্ত প্রসারিত। সাহিত্যে, নাটক ও ইতিহাস দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সৈয়দ হক নাটকটিতে ইতিহাসের অস্তিত্বমান স্তরের সাথে কল্পনাপ্রসূত ভাসমান স্তরের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। নাটকটিকে সময় বিবেচনায় একটি সাহসী পদক্ষেপ বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রবন্ধে ইতিহাসের গণনায়কের চাওয়া, কিংবা চেয়ে না পাওয়ার কারণ চিত্র বিশ্লেষণ করা হবে।

১.২ অধ্যয়ন পদ্ধতি

নাটক এমন একটি বিষয় যার তথ্য বা উপাত্ত সংখ্যায় গণনা কিংবা পরিমাণে বিশ্লেষণ করা যায় না। এতে মূলত তথ্য বিশ্লেষণ করে এর গুণগত অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে আহরিত তথ্য সংখ্যায় প্রকাশ না করে শব্দে ধারণ করা হয়। গবেষণার প্রকৃতি, বিষয় ক্ষেত্র প্রাপ্ত সুযোগ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে বক্ষ্যমাণ গবেষণায় এক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। গবেষণার মূল ভিত্তি যেহেতু সৈয়দ হকের *গণনায়ক* তাই আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি এই গবেষণার মূল আধার। মূলত সাহিত্য গবেষণা ক্ষেত্রে এটি বহুল প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি। নাটকটি যেহেতু ’৭৫ এর ইতিহাস অবলম্বনে লেখা তাই কেবল পর্যালোচনা বিশ্লেষণের সহজ ও সরল উপায় প্রযোজ্য নয়। কারণ পাঠের আপাত দৃশ্য থেকে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের নব অধ্যায় অন্বেষণ করে জ্ঞানের নবতর দিক উন্মোচন গবেষণার উদ্দেশ্য। ইতিহাস যেহেতু নাটকটির খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় তাই ’৭৫ ও এর পরবর্তী ইতিহাসে ঘটনাক্রমে, ঐতিহাসিক উপকরণ, বিভিন্ন দলিল গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে। মূলত প্রবন্ধটি সাহিত্য গবেষণায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সহায়তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া হবে। নাটকটি তথ্য বিশ্লেষণের স্বার্থে নির্ভুল তথ্য সন্নিবেশনের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট রীতির আশ্রয় নেওয়া হবে। গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হবে সৈয়দ হকের *গণনায়ক* নাটকটি থেকে। পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিন্যস্ত বিভিন্ন বস্তুর মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সঠিক বস্তুটির অন্বেষণ করে এবং তার বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করার স্বার্থে ক্ষেত্র বিশেষে বর্ণনামূলক পদ্ধতি এর সাহায্য নেওয়া হবে। যেহেতু গবেষণা নিয়মতান্ত্রিক কাজ, তাই সুষ্ঠু গবেষণা পরিচালনা করার স্বার্থে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সঠিক ও প্রাসঙ্গিক সত্য উন্মোচনের স্বার্থে মিশ্র পদ্ধতিতে গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়াস চালানো হবে।

১.৩ সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণাটি যেহেতু ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনাকে করে, তাই সত্যতা সংক্রান্ত জটিলতা নেই। এই বিষয়টি নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বহু গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বা কাছাকাছি বিষয়ে যে সকল গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে তার শূন্যতার ওপর নির্ভর করে গবেষণাটি সম্পাদিত হবে। উল্লেখ স্বাধীনতার পূর্ব সময় থেকেই বাঙালি জাতির এই নায়ককে কেন্দ্র করে গান ও কবিতা রচিত হতে থাকে।

গবেষণাটি তাই স্বাধীনতার পূর্ব থেকে কেন্দ্র করে গণনায়কের মহিমান্বিত গৌরবগাঁথা সময় থেকে শুরু করে তার পতনের পর পর্যন্ত সম্পাদিত হবে। স্মর্তব্য *গণনায়ক* নাটকটিকে নিয়ে ইতোপূর্বে পূর্নাঙ্গ গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। তবে সৈয়দ হকের নাটককে কেন্দ্র করে সামগ্রিকভাবে কিছু গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। সৈয়দ হকের নাটক সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

১. জলেশ্বরীর জাদুকর, সৈয়দ শামসুল হক সম্মাননা সংকলন, ঢাকা,কথাপ্রকাশ,২০১৫ নামক বইটিতে লেখক ও নাট্যকার হিসেবে শামসুল হককে মূল্যায়ণ পূর্বক বেশ কিছু প্রবন্ধ, নিবন্ধ, স্মৃতিকথা প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা হয়েছে। বইটির নাট্য পর্যালোচনা অধ্যায়ে গণনায়ক, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ, নুরলদীনের সারা জীবন, নাট্যকারের নির্দেশনা কৌশল প্রভৃতি নিয়ে কবীর চৌধুরী, আতাউর রহমান, বিভাস চক্রবর্তী, ফেরদৌসী মজুমদার, বিশ্বজিৎ ঘোষ, বিপ্লব বালা, তানভীর মোকাম্মেল, আলী যাকের প্রমূখ লেখক বিজ্ঞ মন্তব্য জ্ঞাপণ করেছেন। বইটিতে সৈয়দ হকের গণনায়ক প্রবন্ধটিতে কবীর চৌধুরী যথেষ্ট বিজ্ঞতার সাথে আলোকপাত করেছেন বাংলার জনগণের নায়ক সংক্রান্ত বিষয়ে। প্রবন্ধটি বর্তমান প্রবন্ধকারের মনে যথেষ্ট ভাবনার উদ্রেক জাগাতে সক্ষম হয়েছিল।

২. রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা:৬, শরৎ ১৪২৯ এ জান্নাত আরা সোহেলী অপেক্ষমাণ: সৈয়দ শামসুল হকের নিরীক্ষাধর্মী সামাজিক কাব্যনাটক বিষয়ক প্রবন্ধে সমাজের অসঙ্গতি, নারীর প্রতি বৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক সম্যাকে চিহ্নিত করেছেন। তবে তাঁর প্রবন্ধটিতে *গণনায়ক* বিষয়ক বিশেষ কোন আলোচনা নেই।

৩. প্রফেসর ড. আব্দুল্লাহ আল ফারুক সম্পাদিত বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর, গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনা দপ্তর , চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বইটিতে শাকিলা তাসমিন সৈয়দ হকের নাটকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমীক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধটিতে গবেষক মূলত পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ, আমাদেও জন্ম হলো, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, উত্তরবংশ এই পাঁচটি নাটক নিয়ে আলোচনা করেছেন । *গণনায়ক* বিষয়ক কোন পর্যালোচনা গবেষণাটিতে নেই।

৪. মোঃ জাহিরুল হক রচিত দুই বাংলার প্রতিবাদী চেতনা নামক বইটিতেও গননায়ক বিষয়ক আলোচনা পাওয়া যায়নি। তবে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ প্রভৃতি নাটক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা হয়েছে।

৫. প্রসঙ্গ নাট্য এবং , যৌথ সম্পাদনা থিয়েটার ও বিশ্ব সাহিত্য ভবন নামক বইটিতে শামসুল হক মমতাজউদদীন আহমদকে উদ্বেশ্য করে শুভেচ্ছা বার্তা লিখলেও বইটিতে তাঁর নাটক সংক্রান্ত কোন আলোচনা নেই।

৬. নাট্যবিদ্যা, থিয়েটার ও পারফরমেন্স স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা জার্নালে ওয়াহিদা সুলতানার কাব্যনাটক ঈর্ষা: প্রেম, জৈবিক প্রবৃত্তি ও মনরস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন শীর্ষক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। এটিতেও *গণনায়ক* সংক্রান্ত আলোচনা বা পর্যালোচনা নেই।

৭. আমিনুর রহমান সুলতান রচিত সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য নামক বইটিতে লেখক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা ও মানবমুক্তিকে কেন্দ্র করে সৈয়দ হকের কবিতা, উপন্যাস ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটককে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। এই বইটিতেও *গণনায়ক* বিষয়ক কোন লেখা নেই।

সুতরাং পূর্বোক্ত গবেষণাগুলোর প্রতি যথাযথ সমীহ প্রদর্শন পূর্বক যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার শূন্যতাকে চিহ্নিত করে তা পূরণের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাঙালির নৈরাশ্যের বিপরীতে আশার আলোকবর্তিকা জাগিয়ে তোলার প্রয়াস চালানো হবে। যেহেতু *গণনায়ক* পাণ্ডুলিপিটিকে ঘিরে নাট্য কেন্দ্রিক একাডেমিক গবেষনা গুণগত পদ্ধতিতে খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না তবুও ইতিহাসকেন্দ্রিক

আলোচনার মাধ্যমে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গবেষণায় ব্যবহৃত হবে। সংশ্লিষ্ট গবেষণায় বাঙালি জাতির এখন যে তথ্য বিভ্রান্তি রয়েছে তার যুক্তি পরম্পরায় গুরুত্বের সাথে বস্তুনিষ্ঠরূপে উপস্থাপিত হবে।

১.৪ গণনায়কের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব

পাণ্ডুলিপিটির মূল চরিত্র তথা, গণনায়কের নাম *ওসমান*। চরিত্রটি মূলত ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট রাতে ঘটে যাওয়া সত্য নারকীয় কাহিনিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। ১৫ আগস্টের রাতে ঘটে যাওয়া কাহিনির মূল বিষয় স্থান ও কালের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাপেক্ষে *গণনায়ক* পাণ্ডুলিপিটি গঠিত হয়েছে। গণনায়কের বাস্তবিক পরিচয় হলো শেখ মুজিবুর রহমান (১৭ মার্চ ১৯২০- ১৫ আগস্ট ১৯৭৫)। তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত। জনগণের অধিকার ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে "শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবনের সব থেকে মূল্যবান সময়গুলো কারাবন্দি হিসেবে কাটাতে হয়েছে"।[১] তবে তিনি জীবনে কখনো আপোস করেননি। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর প্রত্যয়ে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বাঙালির অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশ ভারত থেকে ভারত বিভাজন আন্দোলন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কেন্দ্রিয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। বাঙালি জাতির এই স্থপতিকে বাংলাদেশে জাতির জনক হিসেবে সম্মান প্রদান করা হয়েছে। "তিনি ১৯৭২ সালে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "এদেশের জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের কথা"।[২] ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তাঁর বেরিবেরি রোগ হয় ও ১৯৩৬ সালে তার চোখে গ্লুকোমা রোগ নির্ণয় করেন তৎকালীন চিকিৎসকগণ। এরপর থেকে তিনি চশমা পড়া শুরু করেন। তার রাজনীতিতে পদচারণা তখন থেকেই, স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯৩৮ সাল নাগাদ স্থানীয় কলহে তিনি "জীবনে প্রথম জেল"[৩] খাটেন। ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় "প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য"[৪] নির্বাচিত হন। এরপর বহু চড়াই উৎরাই ও বাঁধা বিপত্তির মাধ্যমে তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারে এই সবুজে ঘেরা ভূ-খণ্ড অধিকার করে বাঙালি জাতি।

১.৫ ড্রামাটিক পাণ্ডুলিপি গঠনে গণনায়ক প্রসঙ্গের যৌক্তিকতা

মূলত *গণনায়ক* পাণ্ডুলিপিটি ও *শেখ মুজিবর রহমান* ইতিহাসের একই সূতায় গাঁথা। তিনি বাঙালির রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় পাকিস্তান হায়েনার দল থেকে রাষ্ট্রকে ছিনিয়ে আনতে নিরলস শ্রম দিয়ে গেছেন। তাঁর নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিকানা লাভ করেছে। "His dream was to make an independent nation state both politically and economically for the Bengalis of east Bengal"[৫] তাঁর ক্ষুদ্র জীবনের আদর্শ বিলুপ্ত না হতে দেওয়ার প্রত্যয়ে নাট্যকার সৈয়দ হক তাঁর *গণনায়ক* পাণ্ডুলিপিটি পাঠকের দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। "Broadly speaking, a play is the representation of man in action."[৬] মানুষের বাস্তবিক জীবনের ক্রিয়া বিন্যাস নাটকে উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে তাকে প্রথমে ঘটনা বাছাই করতে হয়, এরপর বিন্যাস করতে হয়। আর সামগ্রিক কাজটি করতে গিয়ে একজন নাট্যকার কল্পনার আশ্রয় নিতে পারেন। তবে তিনি ততোটুকুই গ্রহণ করতে পারেন, যেভাবে একটা নাটক দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। নাটকের প্লটের স্বার্থে স্থান কালের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। তাঁকে ঘিরে তৎকালীন রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশে নাটক রচনা করা হয়েছে, কাল " He was able to interrelate with the masses because of his common quality of leadership"[৭]। তবু বাঙালি তাঁকে সচেতনভাবে ইতিহাসের পাতায় অতিদ্রুত ঠাঁই দিয়েছে কিংবা বাধ্য হয়েছে। তাইতো নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেন, "বাঙালী উনবিংশ শতাব্দীতে নিজের চেষ্টায় উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু তখনি তা চরিত্রের দোষ ও

দুর্বলতা দূর করিতে পারে নাই"।[৮] সামনে দেখতে গেলে বাংলার স্বাধীনতার জন্য যার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম ত্যাগ রয়েছে। বাঙালি হিসেবে নৈতিক দৃষ্টিপাত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা অত্যন্ত জরুরি। অবস্থানগত কোটর নিজেদের মুক্ত করা সব সময় সহজ নয়, কিন্তু নীতি চিন্তাভাবনাকে সামনে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ খুব জরুরি। "কান দিয়ে শোন জায়গা বদল করো সুবিধা মতন, আর দেখার চেষ্টা করো কোনটা বিচার, কোন জনই বা চোর"?[৯] জায়গা বদল করার অর্থ হচ্ছে পৃথিবী লুকিয়ে থাকা জিনিস খুঁজে বের করা কিংবা লুকানো দেখার উপায়। একটি অত্যন্ত শক্তিশালী নাটক রচনার মধ্যদিয়ে সৈয়দ হক জায়গা বদল করার রূপকে তৎকালীন ইতিহাসকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন। বাঙালির অবস্থানগত সীমাবদ্ধতাও পাণ্ডুলিপিটির আরেকটি উদ্দেশ্য। মূলত, মানুষ যা তার দৃষ্টির সীমার মধ্যে দেখতে পায়, তার কাছে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। যে অবস্থান থেকে সে তার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই কোন কিছু দেখা ও এই মোতাবেক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ব্যক্তির অবস্থানের ওপর নির্ভর করে। মূলত গবেষণাটিতে সৈয়দ হক দ্বারা উৎপাদিত নাটকের জ্ঞান প্রকল্পে অংশগ্রহণ প্রবন্ধকারেরর অভীপ্সা। তাঁর ডিসকোর্সে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে নাটকে উৎসাহী পাঠকের সাথে গন্তব্যে পৌঁছনোই প্রবন্ধকারের প্রধান উদ্দেশ্য। কেননা বাংলাদেশের জনগণের সাথে সৈয়দ হক যে ডিসকোর্স গড়ে তোলেন তাকে ঘিরে একটি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয়। নিঃসন্দেহে গণনায়কের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সামুদ্রিক। তাই তার আদর্শকে ঘিরে নাট্যকলায় জ্ঞানতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা থেকে প্রবন্ধের তথ্য ও উপাত্তের তালাশ চালানো হবে। প্রবন্ধটি ১৭ কোটি বাঙালির নৈরাশ্যের বিপরীতে আশার প্রামাণ্য দলিল হবার দাবী রাখে।

১.৬ তাত্ত্বিক কাঠামো

নাট্যকলা বিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ইতিহাসভিত্তিক লেখার মূলসূত্রে সৈয়দ হক কেবল ট্র্যাডিশনাল লেখক নন, তাঁর লেখকীয় সত্তা গঠিত হয়েছে নাট্যকলা বিষয়ক নিজস্ব অনুশীলনের পাটাতনে। তাঁর *গণনায়ক* তেমনি একটি পাণ্ডুলিপি। যেহেতু এটি ইতিহাস ভিত্তিক পাণ্ডুলিপি, সেক্ষেত্রে ইতিহাসকে উপজীব্য করে এগিয়ে চলার প্রয়াস থাকবে। আলোচ্য টেক্সটের মূল আলোচনা বাঙালির গণনায়ককে কেন্দ্র করে তাই তাঁর জীবনের চিত্র তুলে ধরা বাঙালির নৈতিক দায়িত্ব। একজন সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি বাংলাদেশের নাট্যশিল্পে স্পষ্টতই নিজস্ব স্কুলিং তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই *গণনায়ক* এদেশের রাজনীতিতে ব্যক্তি-ঐতিহ্যের রূপক। রাজনীতিতে নিজস্ব অনুশীলনের মধ্যদিয়ে জাতির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের জটিল সামষ্টিক আবহমানতাকে বিধৃত করার লক্ষ্যেই তিনি নিজেকে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। যুদ্ধপরবর্তী দেশে "১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসার পর সরকার প্রধান হলেন"।[১০] নিজের সময় চেতনা ভিত্তিক নির্মাণকে জাতির প্রত্নতাত্ত্বিক আদর্শে জাস্টিফাই করার ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতায় গণনায়ক বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭১ এর ভোরে গণনায়ককে হত্যার পর থেকে "বাংলা রেডিও হয়ে গিয়েছিল রেডিও বাংলাদেশ"[১১] এবং "জয় বাংলা পাল্টে হয়ে গেল বাংলাদেশ জিন্দবাদ"[১২] এরপরে আরও বহু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

নাটকটি শুরু হচ্ছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিকান্দারের দফতর থেকে মঞ্চে সিকান্দারকে দেখা যাচ্ছে এবং নেপথ্যে জনতার কণ্ঠে "গণনায়ক জিন্দবাদ, জয় জনতা"[১৩] প্রভৃতি স্লোগান ধ্বণিত হচ্ছে। নাটকের শুরুতেই নাট্যকারের নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে তুমুল জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। আর এই প্রক্রিয়ায় সৈয়দ হক নাটকে দ্বন্দ্বের অবতারণা ঘটান। কারণ দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ। নাট্যলেখনীর প্রায়োগিক সূত্রে নেপথ্যে উচ্চারিত স্লোগানের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় উপস্থিত পরিক্রটির জ্ঞানকাণ্ডের একটি নির্মীয়মান ধারা।

অত্যন্ত আক্ষেপ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি তাঁর রাজনৈতিক সহযাত্রীর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তায় তার ভেতর জন্ম নেয় ঈর্ষার পৈশাচিক আবেগক।

"কিসের আনন্দ? কিসের উৎসব? কিসের শ্লোগান?
আপনি তো তথ্যমন্ত্রী, মীর্জা, আপনিই বলুন, গণনায়ক
বিদেশ থেকে ফিরলেই সম্মানের নতুন কোন মালা নিয়ে?[১৪]

তার দ্বন্দ্বের মূল কারণ তিনি দেশের একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এদেশে তিনিও একজন সেবক। কিন্তু তাকে ভাগ্যের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। তিনি আক্ষরিক অর্থেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, গননায়ক সফলতার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে একইসাথে রাজনীতি করার পরও আশাতীত জনপ্রিয়তা না পাওয়ায় তারা এর অন্বেষণের চেষ্টা করে, ভবিষ্যৎ পরিণতিতে তারা পরিবর্তন চায়, তারা প্রলুব্ধ বোধ করে। তবে অচিরেই তারা আবিষ্কার করে এমন অনুসন্ধানের কার্যটি শুরু থেকেই একাধিক কার্যকারণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তারা পূর্ণাঙ্গ পরিসরে সেবামূলক কর্মকাণ্ড থেকে মানসিক ও শারিরীকভাবে অনুপস্থিত, যা গণনায়ক চরিত্রটির মধ্যে তারা বিদ্যমান বলে অনুধাবন করে। তারা আরও অনুধাবন করে, গণনায়ক যেকোন পরিসরে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই ছিল তাদের ঈর্ষা ও অসংযত আচরণে প্রাথমিক কারণ।

"কিন্তু জনগণ? তারও তো চায় তাঁকে"।[১৫]

ব্যাপারটি ক্রমশ তাদের কাছে কঠিন হয়ে পরে এতে বাঙালি জাতির প্রত্যাশা একটি বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল এবং আজও রাখছে। বাঙালির আশার বিষয়টি যুক্তিতে নিরূপণ করা কঠিন এটি জাতির নিজস্ব অভিজ্ঞার উপাদান। সবশেষে ১৫ আগস্ট পৈশাচিক ঘটনাটি ঘটেছে যার সামগ্রিক তথ্য আজও অধিকাংশই গোপন রয়েছে। '৭৫ এ হিসাব কষতে ব্যর্থ হওয়া একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে সৈয়দ হক তাই সত্যের সম্ভাব্যতা উল্লেখ করে রচনা করেছেন *গণনায়ক*।

মূলত, গণনায়কের দেশপ্রেমের ন্যায্যতার যুক্তিনির্ভর বিচার বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বাঙালি জাতি। বাঙালি খুব সহজেই প্রচলিত মতবাদে বশীভূত হয়ে পরে। যেমন- কোথাও যদি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটে, তখন ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্মবিচারে ব্যস্ত না হয়ে প্রতিবাদ করাটাই যুক্তিযুক্ত কাজ। কারণ এটি সত্য যে, এমন একটা ভয়ানক ঘটনাকে তখনই অন্যায় বলা যায়, যখন মানুষ জানে তা নিবারণ করা যেত, বিশেষত নিবারণের চেষ্টা করা যাদের কর্তব্য ছিল তারা তা করেনি। এখানে স্পষ্টতই উপলব্দি করা যায় '৭৫-এর বিপর্যয়ের ঘাতকের চরিত্র জটিল ও সূক্ষ্ম। তাই ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল গণনায়ককে। কারণ "ন্যায্যতার মূল্যায়ন আর যা-ই হোক, সহজ সরল নয়"।[১৬] গণনায়কের দেশ প্রেমিক সত্তা মূলত একটি সর্বশ্রেষ্ঠান্বেষী ও তা বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার। তার দেশপ্রেমের খাতিরে ক্ষমতার সংস্পর্শে যাওয়া। তাঁর অর্জিত জ্ঞান ও ক্ষমতা তাই দেশের স্বার্থের পরিপন্থী নয়। ঘাতক দল তাঁর অর্জিত দেশপ্রেম লুণ্ঠনের তাগিদে প্রথমত টার্গেট করেছিল তাঁর দেশপ্রেম হতে অর্জিত জ্ঞানকে। মানবীয় সভ্যতায় পাশবিক জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাশবিক স্বর থেকে মানবীয় স্তরে নিজেদের উন্নীত করার বদলে এমন এক ধারার সৃষ্টি করেছে, যার ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে তাদের জন্য তিরস্কার সূচক মতবাদের জন্ম নিয়েছে। ১৯৭৪ এর ৩১ মে গণনায়কের মাতা সাহেরা খাতুন মারা গেলে মুজিব গেলেন টুংগিপাড়ায়। সঙ্গে ছিল দুজন মন্ত্রী। "শেখ মুজিব তার মায়ের জন্য যত কাঁদলেন না, তার চাইতে বেশি কাঁদলেন মোশতাক"।[১৭] বিচিত্র এই চরিত্রটির মাথায় সর্বদা টুপি থাকত। আলোচ্য *গণনায়ক* পাণ্ডুলিপিতে নাট্যকার তেমনি কিছু রাজনৈতিক চরিত্রের চিত্র করেছেন, যাদের যাবতীয় জ্ঞান গণনায়কের শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে সদা তটস্থ থাকত। তারা নিজে গণনায়কের কাজ থেকে নিজেদের দূরে

রাখত না। কারণ সম্ভাব্য তাড়নাজাত সন্তুষ্টির পরিমাণ এতটাই কম ছিল যে, তারা পারস্পারিক সম্পর্ককে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করে, কাজের সক্ষমতাকে ব্যবহার করে সামনে এগিয়ে গেছে। এহেন প্রতিটা ব্যক্তি ছিল গণনায়কের শত্রু বিষয়টা বেশ লক্ষ্যণীয় কারণ মানুষ একা থাকতে পারে না তাই যৌথ জীবন যাপন করার লক্ষ্যে গণনায়ক তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী জানা সত্ত্বেও ভারী এক পাশবিক বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

"তাহলে সে ঐ সানাউল্লাহ, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
পড়াশোনা প্রচুর, পর্যবেক্ষণ সুতীক্ষ্ম, বিশ্লেষণে নীরব
কিন্তু মর্মভেদী। তোমার মতো খেলাধূলায় মন নেই,
গান শোনে না, হাসে কদাচিৎ। এরা হচ্ছে অসুখী মানুষ
এদের প্রতিভা এক বিশ্রামহীন বৃত্তি
নিয়োজিত তুলনা ও প্রতিতুলনায়। অতএব বিপজ্জনক"।[১৮]

তবু পাশবিকতার বিপরীতে মানবিকতাকে আত্মসর্পণ করা হয়। এহেন উদ্দেশ্যের কারণ বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় করার এটি প্রয়োজনীয় কৌশল। তাদের বৈরী ভাবাবেগ থাকা সত্ত্বেও দেশের শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে এহেন পাশবিক আচরণের তোয়াজ করতে হয়েছে গণনায়ককে এতে স্পষ্টতই প্রতীয়মাণ হয়, ক্ষমতা ও বল প্রয়োগের মান নিজেদের টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এটি ছিল একটি চাপানো প্রক্রিয়া। অবশ্য, সভ্যতার যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন গণনায়ক হয়েছিলেন, সেই সব ত্রুটি চিহ্নিত করা তাঁর জন্য খুব কঠিন ছিল না। বাঙালির ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের জন্যই তিনি এ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

" হুমায়ুন। নরেন্দ্র আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছে, কাল
অঘ্রাণের কৃষ্ণা দশমী থেকে -
নরেন্দ্র। সর্বপ্রকার শুভকর্ম মাসদগ্ধায় নিষিদ্ধ, শাস্ত্রে তাই বলে।
ওসমান। পাগল একটা। চলো যাই"।[১৯]

বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য যে, ১৯৭২ সাল থেকে গণনায়ক আমলাতান্ত্রিক জালে বন্দী হয়ে পড়েন। এর প্রধান কারণ হলো, তাঁর যে প্রধান ক্ষমতার উৎস অর্থাৎ জনগণ, এই জনগণ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। তাকে ধ্বংসের মাধ্যমে আদতে দেশ কেবল প্রশাসনিক ক্ষমতাই হারায়নি, বরং অনভিজ্ঞতার জোয়ারে গা ভাসিয়েছে। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা। তাঁর উত্থানে দেশের উত্থান, পতনে দেশের পতন। জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে সিরাজুল ইসলাম বলেন, "জাতীয়তাবাদ আসলে একটা অনুভূতি। তাতে দেশপ্রেম থাকে কিন্তু দেশপ্রেম থেকে আবার তা স্বতন্ত্রও বটে, ব্যাপকও"।[২০] তিনি রাষ্ট্রে ধর্মের ভেদ রাখতে চাননি। সবাই নাগরিক অধিকার ভোগ করবে, এই কামনা তাঁর ছিল। তাঁর চাওয়াটা ছিল খুব স্বাভাবিক কারণ এর মাধ্যমে তিনি জনগণের অতি নৈকট্য লাভ করতে পেরেছিলেন। এককালে বাঙালি মুসলমান যেমন পাকিস্তান চেয়েছিল, পরে তারাই বাংলাদেশ অর্জনের জন্য গণনায়ককে সর্বাগ্রে সমর্থণ দিয়েছিল। এই পথে আতঙ্ক তৈরি করে মুষ্টিমেয় মানুষ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ওপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ '৭৫ এর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সভ্যতার স্বাভাবিক নয়, বরং কতিপয় ত্রুটি থেকে উৎসাহিত। প্রধান কারণ মানুষের প্রকৃতি জেনেও তাদের প্রতি ভরসা স্থাপন। সৈয়দ হক সামগ্রিক বিষয়টি পাশ্চাত্যের ভাবনার সাথে এদেশীয় রাজনৈতিক বলয়ের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন অত্যন্ত নিপূর্ণ হাতে। *'জুলিয়াস সিজারের'* প্লটের সাথে মিল থাকলেও এ যেন সম্পুর্ণ আলাদা। নাটকটিকে রাজনৈতিক বিবেকের পালা বলতে অত্যুক্তি হবে না। জীবন-রাজনীতি, ন্যায়- অন্যায়, ব্যক্তি-সমষ্টি, দেশপ্রেম সবকিছু মিলে সমগ্র নাটকটিতে নাট্যকারের অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়েছে।

নাটকটির প্রথমাংশে গণনায়কে হত্যার পরিকল্পনা ও হত্যা করা হয়। ইতিহাসের মূল প্রেক্ষাপট থেকে সৈয়দ হক কিছুটা সরে এসে কেবল গণনায়ককে হত্যার চিত্র অঙ্কন করেছেন। সভ্যতার বিবেচনায় এই হত্যা সংক্রান্ত ঘটনাটি যেভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন, তা চূড়ান্ত গুরুত্ব বহন করে। নাটকটিতে বিরুদ্ধ শক্তি ক্ষমতা অর্জনের জন্য রাষ্ট্রপক্ষকে যতোই নিয়ন্ত্রণ করুক, এর ফল দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সাধারণ জনগণের মনোজগতে স্থান নেয়। অন্তত গণনায়কের মৃত্যুর পরের ঘটনা, কিংবা অনবরত তাঁর পক্ষ নিয়ে সাধারণ জনগণের স্লোগানের বিষয়টি এভাবেই বিবেচনা করা যেতে পারে। নাটকের চূড়ান্ত প্রশ্ন তখনই সৃষ্টি হয়, যখন গণনায়ককে হত্যা করা হয় এবং তাঁর ওপর চাপানো দুর্দশার মাত্রা আদৌ কমানো সম্ভব কিনা তা রশিদ চরিত্রটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। তাকে আবশ্যিকভাবে বিরুদ্ধ শক্তি শান্ত রাখার চেষ্টা করে, বিদ্যমান সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে চেষ্টা করে, ক্ষতিপূরণ দেবার লোভ দেখায়। রশিদ দেখে তার অগ্রগমনে বলপ্রয়োগের চিন্তা অপসারণ না করলে বিরুদ্ধ শক্তিকে অপসারণ করা অসম্ভব। এই বিরুদ্ধশক্তি জড়বুদ্ধি সম্পন্ন, তাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে নিকটে আসা সম্ভাবনা দূরে ঠেলে দিতে হয়। তাই সে তাদের শৃঙ্খলাহীন কাজে সহায়তা করবে বলে সম্মতি দেয়। সভ্যতার অস্তিত্বের স্বার্থে আবশ্যকীয় প্রত্যাখ্যানগুলো সে মেনে নেয়। বিরুদ্ধ শক্তির সাথে গণনায়কের চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তখন, যখন তিনি স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে নিজস্ব পরিমণ্ডলে যতটা না ছাড় দিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি ছাড় দিয়েছিলেন তাদের। আর এই সুযোগে তারা ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের করে নেবার স্বপ্ন দেখে ও সফল হয়।

"আগামীকাল বর্তমানকাল হবার আগেই তাকে ঠেলে দিল
অতীতে, বলবান একটা আঘাতে। বিলম্বের অবকাশ নেই।
সিদ্ধান্ত গৃহীত কর্তব্য নির্ধারিত, আয়োজন সম্পূর্ণ"।[২১]

রশিদ ন্যায্যতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে, প্রধানত সে দেখতে চেয়েছিল গণনায়কের পক্ষে কার কার অবস্থান এই বিষয়টি। সে বিশৃঙ্খলা দূর করে একটা সুব্যবস্থায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নিজের সাথে নিজে চুক্তি করেছিল। স্পষ্টতই সে গণনায়কের আদর্শ নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি আবদ্ধ হয়েছিল। এটাও স্পষ্ট, এই আদর্শে পৌঁছাতে তার কিছু ব্যক্তির সহায়তা নিতে হবে। এটা বেছে নেওয়াই ছিল তার জন্য গণনায়কের সাথে মানসিক চুক্তির পরবর্তী পদক্ষেপ। সুতরাং ন্যায্যতার পাওনা সে গণনায়ককে দিতে ছিল বদ্ধ এই রাজনীতিবিদ সমাজের পক্ষে যেমন আচরণ করা উচিত। রাজনৈতিক ও নৈতিক মাপকাঠি অনুযায়ী করেছে। বাঙালি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রশিদের আচরণ ছিল ন্যায্য। স্পষ্টতই তার ন্যায্যতার হিসাব পরিমাণে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ঘাতক বাহিনী যখন দলবদ্ধ ভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে তার নীচে আঁকছিল, তখন রশিদ একা সাহসের সাথে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়। সে ঘাতকের কৃতকর্মের বিচার পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়। আর এই কার্যে অগ্রগতির স্বেচ্ছায় ঘাতক বাহিনীর সাথে হাত মেলায়, যাতে সাথে মিশে সর্বস্তরে গণনায়কের মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে দেওয়া যায়।

"স্বীকার করি, শোকে আমার হৃদয় বিদীর্ণ। কিন্তু রাজনীতিতে
শোকের কোনো স্থান নেই। ক্ষুব্ধ হতে পারি। বিদ্রোহ?
তাও করতে পারি। কিন্তু তাতে অপরাধী হবে।
হুমায়ুন সাহেবের চোখে, সানাউল্লাহর কাছে। এবং
তাঁরা হচ্ছেন বাংলার বিশিষ্ট সন্তান। বরং আমি
অপরাধী হবো নিজের কাছে, আপনাদের কাছে এবং পররোকগমন
এই মানুষটির কাছে"।[২২]

গণনায়ক স্বদেশে ফিরেই সমগ্র বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি সব কিছু মেনে নিলেও গণহত্যা মেনে নিতে চাননি। শাসনভার গ্রহণ দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি "বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ, ১৯৭২"[২৩] জারি করেন। তিনি ঘাতক দলে যারা সহায়তা করে মানবতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে জঘন্যতম কাজ করে পরিচিহ্নিত হয়েছে তাদের শাস্তি বিধান তিনি করতে চেয়েছিলেন।জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই আইনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে এদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে তিনি অভ্যন্তরীণ চাপের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি "৩০.১১১.৭৩ তারিখে"[২৪] সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি শরণার্থীর তিনি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে, প্রায় ৪৩ লক্ষ বাসগৃহ পুনর্নির্মাণ খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করাকে তিনি দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি আরও অনেক অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এরপরও ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে তাকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু খরা, খাদ্য ঘাটতি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে তার সরকারকে কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি ও বাঙালি জাতিকে যে তিনি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন তা ঘাতকের দল বেমালুম ভুলে গিয়ে ১৫ আগস্ট জাতির আদর্শকে হত্যা করে। সৈয়দ হক একজন সাহসী নাট্যকার হিসেবে পুরো জাতির বিবেকের দংশনকে রশিদ চরিত্রটির মধ্যদিয়ে প্রস্ফুটিত করেছেন। রশিদ একই সাথে দেশ প্রেমিক, নির্ভীক, সে সামনে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রক্ষণশীল ঘাতক দলের পরিকল্পনায় অভিনব কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। এই ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে তাদের অপসারণ করা কোন মাত্রায় সম্ভব করতে সক্ষম হয়নি রশিদ "সম্ভবত মানব জাতির কিছু শতাংশ প্যাথলজিক্যাল প্রবণতা অথবা মাত্রাতিরিক্ত তাড়নাজাত শক্তির কারণে বরাবরই অসামাজিক রয়ে যাবে"।[২৫] রশিদ চেয়েছিল সংখ্যা কমিয়ে বিবেকের অনুসন্ধানের পথ উন্মোচন করতে। সে স্পষ্টতই তার অবস্থান স্বীকার করে নিয়েছিল। তাই পরবর্তী সরকারের নিরলস কাজ করে যায়। কিন্তু ঘাতকের দৃষ্টিতে যে সরকার, তার হিসেব তারা করে রেখেছিল। কিন্তু রশিদ পথ অনুসরণ করতে চেয়েচিল। সে এমন একজনকে সরকার প্রধান হিসেবে চেয়েছিল ন্যায্যতার অভিমুখে যাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়। সে আদতে গণনায়কের মৃত্যুর পর তার আদর্শের প্রসার চেয়েছিল। কিন্তু এর বদলে তাকে বন্ধুক স্বীকার হতে হয়েছিল। রশিদ ঘাতকের কাছ থেকে জাতিকে আদিম পাশবিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেও নিজেরা ক্ষমতা থাকার স্বার্থে তারা এমন একজন মনোনীত করে, যার সাথে কোন প্রকার দ্বন্দ্বে না জড়িয়েও রশিদ বাধ্য হয় তার বিরোধিতা করতে। আশ্চর্যের সাথে সে অবলোকন করে, যাদের সে মিত্র বলে মনে করেছিল তারাই আদতে হত্যা পরবর্তী চক্রান্তে সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে। সে চেষ্টা করে তাদের আকাঙ্ক্ষা সহজভাবে নিষ্পেষণের মাধ্যমে ধনাত্মক অনুভূতি বোধ করাতে। কিন্তু মতিচ্ছন্ন অভিধায় ভূষিত চক্রান্তকারী দল এমন আহ্বানের প্রতিক্রিয়া জানায় অসামাজিক আচরণের মাধ্যমে।

> "টেলিফোন বেজে ওঠে। জেনারেল অনুচ্চস্বরে কথা বলতে থাকেন
> পেছনে ফিরে। রশীদ দরোজার কাছে যেতেই দু'জন প্রহরী উদিত
> হয়। রশীদ আবার নিজের আসনে ফিরে যায়
> তার দিকে তাকিয়ে জেনারেল একবার অন্যমনস্ক অস্ফুট হাসেন"।[২৬]

সভাতা যেমন মানুষকে আদিম পাশবিক অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুশৃঙ্খল জীবন উপহার দিয়েছে, তেমনি সৈয়দ হকও নাট্যকার হিসেবে নৈতিক দিক পালন করেছেন। বৈরি পরিবেশের বিপরীতে হুমায়ুন, সানাউল্লাহ, আকবরের চিত্তে তিনি বিবেক স্থাপন করেন। যদি সমাজে প্রচলিত নিষেধাজ্ঞাগুলোর সাথে তিনি ঘাতক শ্রেণির চিত্তে দহন না স্থাপন করতেন তবে অশুভ আকাঙ্ক্ষাগুলো চিহ্নিত করা কষ্টদায়ক হতো। এতে সমাজে ভালো কিংবা মন্দের ব্যবধান ঘুচে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি বিরাজ

করতো। যদিও নাটকের শেষাংশ নাট্যকারের কল্পনা তবুও নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে প্রাণনাশ করার অভিলাস সভ্যতার পরিপন্থী। আবার ঘটনাক্রমে তা ঘটে গেলেও তার সুষ্ঠু সমন্বয় করা বাঞ্ছনীয়। বৈধতার খাতিরে সকল আকাঙ্ক্ষা সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। এটি সভ্যতার ক্রমবিকাশে "স্বজাতীয় ভক্ষণ"[২৭] এর মতো পরিহার্য হিসেবে গণ্য হবে। সামাজিক জীব হিসেবে একজন নাট্যকার নৈতিকতার দায় এড়াতে পারেন না। নাটক কেবল বিনোদন প্রদান করে না, এর পাশাপাশি এটি শিক্ষাও দেয়। নাটক অবলোকনের মাধ্যমে তাই সমাজের প্রতিটি মানুষ সামাজিক ও নৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে ওঠে। সৈয়দ হক তাঁর *গণনায়ক* পাণ্ডুলিপিটির পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য ঠিক এভাবে সাজিয়েছেন। সানাউল্লাহ ও হুমায়ুনের চিত্তে তিনি ঢেলে দিলেন বিবেক। যদিও বাস্তবিকতার সাথে এর মিল নেই। তবুও যদি ঘাতকের দলের মনের গহীনে অনুশোচনা দগ্ধ করত তবে কেমন হতে পারত, এর সম্ভাব্য ইঙ্গিত সৈয়দ হক অত্যন্ত সুকৌশলে চিত্রিত করেছেন। বারংবার তারা দোটানায় ভোগে, তারা আশা করে, স্বীকৃতি না পেলেও সাহায্য তারা পাবে। তারা বাহ্যিক বলপ্রয়োগ প্রসূত চাপের মুখে ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে দিনাতিপাত করছিল। তাই তারা সভ্যতার নৈতিক দাবির কাছে মাথা নোয়ায়। তারা বুঝতে পারে আগামী রাজনৈতিক চক্রে একই ব্যাপার ঘটবে।

"..তখন তো মনে হবে আপনাদের নেতা-
গুরুভার; সহজে বহনযোগ্য কিছুতেই নয়,
সহজেও ত্যাগ করা সম্ভব নয়"।[২৮]

তারা অনুধাবন করতে পারে নৈতিক অবিশ্বস্ততার ফলে তাদের এহেন দশা। সমাজে অগণিত সভ্য মানুষ রয়েছে, যারা নিজের আগ্রাসী আকুলতার পক্ষে পদক্ষেপ নিতে পিছপা হয় না। এর ফলে তারা অন্যদের ক্ষতিগ্রস্থ করতেও পিছপা হয় না। তারা এহেন আচরণ ততোক্ষণ করে, যতক্ষণ তারা শাস্তি পাবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকে। সমাজে কতিপয় শ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে এই বিষয়গুলো দৃষ্টির অগোচরে যায় না। এর সংস্কার না হলে সমাজে স্থায়ী অসন্তোষ বিরাজ করে, যা বিপদজ্জনক পরিস্থিতির জন্ম দিতে পারে। নৈতিক দাবি থেকে তাই নাট্যকার সৈয়দ হক দেশকে ধ্বংস করার পরিবর্তে বিদ্যমান চরিত্রগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের নৈরাশ্যের এক প্রকার বিলোপ সাধন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে তার নৈতিক অবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণের কাছে গণনায়ক নামক সম্পদ হস্তগত হয়েছে।

১.৭ গবেষণার ফল

গণনায়কের '৭৫ এর বিরহ গাঁথা ঘাতক বাহিনীর নয়, বরং আক্রান্তের অনুভব। আক্রান্ত সংক্রান্ত বোধ হত্যা পরবর্তী অনুভব। হত্যায় বাঙালি ঘাতক শ্রেণি বিকশিত হতে দেখেছে, তাদের হাতে ইতিহাস নানাভাবে লঞ্চিত হয়েছে। যদিও "সামরিক আদালতের বিচারে মোসলেমুদ্দিনকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে"[২৯] তবু বাঙালি এক অপার বেদনায় ক্রন্দনরত। ১৫ আগস্টকে অনেকে অভ্যুত্থান বলছেন। এ বিষয়ে পিটার হেজেলহস্ট বলেন- "সাধারণ অভ্যুত্থানে একটি প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদন থাকে, যা এক্ষেত্রে নেই"[৩০] আবার সাংবাদিক টমাস মুর বলেছেন, "সামরিক অভ্যুত্থানের একটি আদর্শগত অনুপ্রেরণা কাজ করে এ ঘটনায় তার বিন্দুমাত্র স্পর্শ ছিল না"।[৩১] একথা সত্য স্বাধীনতা লাভ করার চেয়ে দেশ গড়া আরও কঠিন কাজ। মুক্তিসংগ্রামের সফলতায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের প্রথম সোপান অতিক্রান্ত করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ছিল আরও কঠিন কাজ। আর এই কাজে প্রয়োজন ছিল ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ও সফল নেতৃত্ব। সময়ের অগ্রগমনের সাথে ইতিহাসের প্রবঞ্চনাগুলো প্রকট আকার ধারণ করে। পৈশাচিক শক্তিগুলো মানবীয় শক্তি হারিয়ে দানবের আকার ধারণ করে। এখান থেকে বাঙালির অসহায়তা শুরু। সময় অবশ্যই বাঙালির জীবন-যাপনের ওপর বর্তানো দুর্দশার ক্ষতিপূরণ দেবে। অবিসংবাদিতভাবে

হায়েনার দল ছিল '৭৫ প্রভু। ধরণী সাক্ষী, আজ ঘাতকের দল ছাড়া দেশ চলতে পারছে। যদিও ঘাতকের আদিম মনোভাবের কিছু পরিবর্তন করেনি। পৈশাচিক এই থাবার কাছে বাঙালি পূর্বে যেমন অসহায়, আজ অসহায়ত্বের যোগ হয়েছে লজ্জা তবে বাঙালি যতো বেশি অগ্রগামী হয়ে উঠেছে, ততোই সমাজে গণনায়কের ভাবাদর্শের ভাণ্ডার অত্যন্ত দৃঢ় হচ্ছে। নাট্যকার সৈয়দ হক গণনায়কের প্রত্যাশিত বাংলার এক চিত্র একেঁছেন, যেখানে নাটকের শেষাংশে দেখা যায়, দেশের চরণ ছুঁয়ে চরিত্রগুলো ঘাতকের পরিখার পরিসর ভেঙেছে বর্তমান সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সুমিশ্রণের যে আঙ্গিক তিনি সৃষ্টি করেছেন স্পষ্টতই সেখানে নৈরাশ্যের বিপরীতে আশার আলোকবর্তিকা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

১.৮ উপসংহার

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অনিবার্য ধারায় এক রক্তক্ষয় মুক্তিযুদ্ধে দেশের তরুণেরা যে দেশ ছিনিয়ে এনছিল, সৈয়দ হক এমন একজন মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বকে ঘিরে সৃষ্টি করেছেন *গণনায়ক*। যার বাস্তবতা ও সত্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন তর্কসাপেক্ষ। গণনায়কের জীবনে নির্মম সত্য ও বাস্তবতার দর্শন এদেশবাসীর জন্য অতীব জরুরি। যদি বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোকপাত করতে হয়, তবে গণনায়কের নামটি স্মরণ করতে হবে। বাঙালি আজও একজন নায়কের অন্বেষণে লিপ্ত। কল্পনার সংমিশ্রণে সত্যকে উন্মোচনের মাধ্যমে *গণনায়ক* নাটকটিতে যে আখ্যান পরিবেশিত হয়েছে শত নৈরাশ্যের মাঝেও তা আশা জাগানিয়া এক আলোকবর্তিকা।

তথ্যসূত্র

১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৯, পৃ. IX
২. *"শেখ মুজিবুর রহমান: ছবিতে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত"*. www.bbc.com. BBC NEWS বাংলা, Published August 15, 2020. accessecd on 29 October, 2022.
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
৪. তদেব, পৃ. ১৭।
৫. Chowdhury, Rahman, et al. *"Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman & Founder of a Nation: European Modern Studies Journal*, Vol-4, no-3, 2020, p. 40.
৬. The Theatre an introduction, p. 23.
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।
৮. নীরদচন্দ্র চৌধুরী। *আত্মঘাতী বাঙালী*। কলকাতা: মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৮৮, পৃ. ১৯৭।
৯. অমর্ত্য সেন। বাংলা সংস্কার, সম্পাদনা-অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, কুমার রানা। *নীতি ও ন্যায্যতা*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, পৃ. ১৮৫।
১০. মুনতাসীর মামুন। *বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি-২০১৩, পৃ. ৭৯।
১১. সম্পাদনা-তপন কুমার দে। *রক্তাক্ত ১৫ আগস্ট* ১৯৭৫। ঢাকা: তাম্রলিপি, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৭১।
১২. তদেব। পৃ. ৭১।
১৩. সৈয়দ শামসুল হক। *গণনায়ক*। ঢাকা: চারুলিপি, ২০১৬। পৃ. ৯।
১৪. তদেব। পৃ. ৯।
১৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০।
১৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৯।
১৭. আবদুল গাফফার চৌধুরী। *ইতিহাসের রক্তপলাশ, পনেরই আগস্ট পঁচাত্তর*। ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০১৭। পৃ. ৫৪।

১৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ২১।
১৯. তদেব। পৃ. ১৩।
২০. সিরাজুল ইসলাম। *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*। ঢাকা দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (UPL), 2000, পৃ. (XIV)।
২১. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৭।
২২. তদেব। পৃ. ৬১।
২৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬৯।
২৪. তদেব। পৃ. ২৭১।
২৫. সিমুন্ড ফ্রয়েড। অনুবাদ- আলীফ হোসেন। *একটি দৃষ্টিভ্রমের ভবিষ্যত*। ঢাকা: সংহতি, ফেব্রুয়ারি ২০১৩। পৃ. ২৩।
২৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৮।
২৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫।
২৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৫।
২৯. অস্ট্রিক আর্যু। *আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৭৬।
৩০. তদেব। পৃ. ৭৭।
৩১. তদেব, পৃ. ৭৭।